'শেষের কবিতা' : চরিত্র চিত্রণ

অমিত রায়

'শেষের কবিতা'র অমিত রায় রবীন্দ্র সাহিত্য তো বটেই, এমনকি সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের এক স্মরণীয় সৃষ্টি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অভিমত এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—"অমিত ও লাবণ্যের প্রণয়-কাহিনী অনন্যসাধারণতার দিক্ দিয়া অতুলনীয়। অমিতের চরিত্রে যে একটা সদা-চঞ্চল, প্রথা-বন্ধন-মুক্ত, বিচিত্র-লীলায়িত প্রাণহিল্লোল আছে, তাহাই তাহার সমস্ত চিন্তা-ধারা ও কর্ম-প্রচেষ্টাকে এমন একটা নৃত্যশীল গতিবেগ দিয়াছে, যাহা আমাদের পদাতিক জীবন-যাত্রার সম্পূর্ণ অননুমেয়। মানুষের এই প্রথাবদ্ধ, পদাতিক জীবনের যান্ত্রিক গতির মধ্যে প্রেম যেন এক বিচিত্র অননুভূতপূর্ব ছন্দের নুপূর নিক্কন।"[১] অমিত-লাবণ্যর প্রণয়কাহিনীকে অবলম্বন করে লেখক এই 'নূপুর নিক্কনকে' শুনিয়েছেন। অমিত রায় 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের নায়ক। কাহিনীর সূচনা হয়েছে তাকে দিয়েই, সমাপ্তিতেও তারই প্রাধান্য। মধ্যবর্তী অংশগুলিতে তার প্রবল হৃদয়াবেগ অনর্গল সংলাপ এবং কবিসত্তার উচ্ছ্বাসময় বহির্প্রকাশ পাঠকচিত্তকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সমালোচকের কঠোর দৃষ্টিতে বিচার করলে এই চরিত্র পরিকল্পনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি যে খুঁজে পাওয়া যাবেনা এমন নয়, তবুও উপন্যাস পাঠের পর 'শেষের কবিতা'র অমিত রায় পাঠক চিত্তকে মোহিত করে রাখে। রসোত্তীর্ণতা যদি কোন সাহিত্যকর্ম বিচারের নিরিখ হয়, তাহলে বলতে হবে 'শেষের কবিতা' ও তার নায়ক নিঃসন্দেহে সফল সৃষ্টি।

অমিত রায় ব্যারিষ্টার। তার বাবাও ছিলেন দিগ্বিজয়ী ব্যারিষ্টার। লেখক জানিয়েছেন অমিতের বাবা যে পরিমাণ টাকা জমিয়ে রেখে গেছেন তা তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এই সাংঘাতিক বিপত্তিতেও অমিত রায় টিকে গিয়েছিল। বি. এ. এর কোটায় পা দেবার আগেই সে অক্সফোর্ডে ভর্ত্তি হয়। "সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে ওর সাত বছর গেল কেটে।" কিন্তু বিদ্যায় তার কমতি ছিলনা। অমিতের বাবা চেয়েছিলেন ছেলের মনে অক্সফোর্ডের রংটা এমন পাকাভাবে যেন ধরে, যাতে দেশে এসেও সেটা টিকে যায়। জীবিকা-নির্বাহে অমিতের আগ্রহ কম। সে বার লাইব্রেরিতে যায় তবে ব্যবসা করেনা, দাবা খেলে। অ্যাটর্নিরা বুঝে গিয়েছে তার কাজে গরজ নেই। অমিতের কথা থেকে জানা যায় দেশে ফিরে কিছুকাল প্রফেসরি করেছিল। কিন্তু বোঝা যায় পিতার সঞ্চিত অর্থই তার সম্বল। অমিত প্রখর যুক্তিবোধ ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

---

১. 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ১৩৮০, পৃ. ১৭৭

তার কথার মধ্যে আছে সম্মোহনী শক্তি। বলিষ্ঠভাবে কথা বলে অন্যকে প্রভাবিত করতে, নস্যাৎ করতে, তার জুড়ি নেই। তার মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রতি বিষয়ে তার কথায় থাকে উচ্ছ্বাস। সচরাচর সবাই যে পথে চলে, যা ভাবে তার সঙ্গে অমিতের মিল নেই। দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে তার গভীর পরিচয়। এদেশের সাহিত্যিকদের রচনারীতি অমিত পছন্দ করেনা। কারণ তাদের রচনায় স্টাইল জিনিসটাই নেই। অথচ তার বিবেচনায় স্টাইলটাই আসল। যারা নিজের মন রেখে চলে স্টাইলটা তাদেরই। অমিতের মতে স্টাইল হল মুখশ্রী, আর ফ্যাশান হল মুখোশ। যাদের স্টাইল আছে তারা সাহিত্যের ওমরাহদলের। ফ্যাশনটা আমলাদলের সম্পদ।

শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, জীবনচর্যাতেও অমিতের স্টাইলে আসক্তি ধরা পড়ে। বেশভূষা, চালচলনে তার নিজস্ব স্টাইল আছে। ওর চেহারাতে এমন একটা ছাঁদ আছে যা পাঁচজনের সঙ্গে এক করে নেওয়া যায় না। অন্যদের মধ্যে থাকলেও তাকে চোখে পড়ে। ''দাড়িগোঁফ কামানো চাঁচা-মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তি-ভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না, মনটা এমন এক রকমের চক্‌মকি যে ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে।'' ওর দলের লোকেরা পড়ে না বলেই অমিত দেশী কাপড় পড়ে। সেই ধুতি যত্নে কোঁচানো, অমিত যে পাঞ্জাবি পড়ে তার বা কাঁধ থেকে বোতাম ডানদিকে কোমর পর্যন্ত নেমে যায়। কোমরের ধুতিটাকে একটা জরি দেওয়া চওড়া খয়েরি রং এর ফিতে ঘিরে রাখে আর তা থেকে একটা ছোট্ট থলিতে ঝোলে ওর ট্যাঁকঘড়ি। পায়ে থাকে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কটকি জুতো। বাইরে যাবার সময় ব্যবহার করে পাট করা মাদ্রাজি চাদর, যা বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলতে থাকে। বন্ধু মহলে নিমন্ত্রণের সময় এরই সাথে যোগ হয় সাদার ওপর সাদা কাজ করা লক্ষ্ণৌ-টুপি। সব কিছু মিলিয়ে অমিত 'ডিস্‌টিঙ্গুইস্‌ড্‌'। ''অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই একেবারে বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে—সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।'' সবাই যা পছন্দ করে অমিতের সেটাই অপছন্দ। অমিত শিলঙ পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল কারণ অমিতের দলের লোকেরা কেউ সেখানে যায়না বলে। নির্জনতা অমিতের ধাতে সয়না, তবুও শিলঙে গিয়েছিল নির্জনতা উপভোগ করতে। ছুটিতে সবাই ছবি তোলে, গল্পের বই পড়ে। যেহেতু অমিত নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চায়, তাই সে ছুটিতে পড়ে সুনীতি চাটুজ্জ্যের 'বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব'।

নিজের দলের মেয়েদের সঙ্গে অমিতের সম্পর্ক অন্য পুরুষের মনে ঈর্ষা জাগায়। অমিত মেয়েদের প্রতি উদাসীন নয়, আবার বিশেষ কারো প্রতি আসক্তিও দেখায় না। সে তাস খেলে, পার্টিতে যায়, ইচ্ছে করে বাজিতে হারে। যে রমণীর গলা বেসুরো তাকে ইচ্ছে করে গাইতে বলে। কাউকে বদ রঙের কাপড় পড়তে দেখলে জানতে চায় কোন দোকানে সেটা পাওয়া যায়। অমিত সম্পর্কে কন্যার মায়েদের মনে আশা জাগলেও কন্যারা

বুঝে নিয়েছে অমিত "সোনার রঙের দিগন্ত রেখা, ধরা দিয়েই আছে তবু কিছুতেই ধরা দেবে না।" অমিত বিয়ে করে না কারণ "বিয়ে ব্যাপারটায় সকলের চেয়ে জরুরি হচ্ছে পাত্রী...। মেয়ে বিয়ে করত সেই পুরাকালে সেই লক্ষণ মিলিয়ে।" সে চায় এমন পাত্রী, আপন পরিচয়ে 'যার পরিচয়।' ঘরে এসে ঘরের লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করাটা বিবাহের লক্ষণ নয়। পাত্রী লেখাপড়া জানলেই চলবে না, তার মধ্যে থাকা চাই কালচার। অমিতের মতে কমলহীরের পাথরটাকেই বলা হয় বিদ্যে। আর তা থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকে বলে কালচার। 'পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি'।

সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাটা অমিতের স্বভাব নয়। মনে মনে সে যাই বিশ্বাস করুক না কেন, বাইরে তার বিরোধিতা সে করবেই। নারীর উপর পুরুষের আধিপত্যের অত্যাচার নিয়ে জনৈক বক্তা পুরুষের নিন্দা করেছিল। অমিত এর প্রতিবাদে হঠাৎই বলে ওঠে—'দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ঙ্কর'। পরে সে ব্যাখ্যা করে বলেছিল পাখিকে যেভাবে শিকলে বেঁধে রাখে, সেভাবেই জোর দিয়ে ছেলেরা মেয়েদের বশ করে। কিন্তু মেয়েরা যেভাবে পুরুষদের বশ করে তাকে তুলনা করা যায় আফিমের সাথে। শেকলের বাঁধায় ভোলানোর কৌশল নেই, কিন্তু আফিমের নেশায় একই সঙ্গে বাঁধাও হয় এবং ভোলানোও হয়। এসম্পর্কে অমিতের অভিমত—"মেয়েদের কৌটো আফিমে ভরা, প্রকৃতি-শয়তানী তার জোগান দেয়"। এটা যে অমিতের মনের কথা এমন মনে করার কারণ নেই, কিন্তু বিতর্কে অংশগ্রহণ করে অন্যের অভিমতের বিরোধিতার জন্যই তাকে একথা বলতে হয়েছে।

দেশ-বিদেশের কাব্য ও সাহিত্যে তার অনায়াস দখল। সে বলে রবি ঠাকুরের কবিতা পছন্দ করে না অথচ রবি ঠাকুরের সকল কবিতার সঙ্গেই তার পরিচয়। শোভনলালের খাতা থেকে লাবণ্য অমিতকে রবি ঠাকুরের কবিতা শোনালে অমিত জানতে চেয়েছিল এটা কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে, কারণ এ কবিতাটি তার চোখে পরেনি। কিন্তু বাইরে সে রবি ঠাকুরের প্রবল বিরোধী। এক সাহিত্য-সভায় অমিত ছিল সভাপতি। একজন প্রাচীনপন্থী মানুষ রবি ঠাকুরের কবিতার প্রশস্তিবাচক অভিমত প্রকাশ করলে অমিত তীব্র বিরোধিতা করে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তার সবচেয়ে বড় অভিযোগ রবি ঠাকুরের মত কবিরা ষাট-সত্তর বয়স্ পর্যন্ত বেঁচে থেকে নিজেকে শাস্তি দেয় ও সস্তা করে তোলেন। বিশেষত রবি ঠাকুর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতা নকল করে অন্যায়ভাবে বেঁচে আছেন। এসময় সে রবি ঠাকুরের প্রতিপক্ষ হিসাবে একজনকে দাঁড় করালো, তার নাম নিবারণ চক্রবর্তী। অমিতের মতে, নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতা ছাপা হয়না, কিন্তু তার কবিতার মধ্যে একটা বলিষ্ঠ মানসিকতা আছে যা রবি ঠাকুরের মধ্যে নেই। আসলে অমিত নিজেই নিবারণ চক্রবর্তী।

শিলঙের এক মোটর দুর্ঘটনা অমিতের জীবনটাকে ওলট-পালট করে দিয়েছিল। যে গাড়ির সঙ্গে অমিতের গাড়ির ধাক্কা লেগেছিল তার আরোহী ছিল একটি মেয়ে। অমিত

অনুভব করেছিল অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মেয়েটির পার্থক্য আছে। এই মেয়েটিই লাবণ্য। দুর্ঘটনায় লাবণ্যর গাড়িটার ক্ষতি সামান্য হলেও তা সারাই করতে কিছুটা সময় নেবে বলে অমিত লাবণ্যকে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে। মেয়েটিও সৌজন্য প্রকাশ করে অমিতকে পরদিন তাদের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানায়। প্রথম পরিচয়েই অমিতের মনে যে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়েছিল, সেটা বোঝা যায় পরের দিনের ঘটনায়। লাবণ্য থাকত যোগমায়ার গৃহে। অমিত লাবণ্যর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে গৃহে প্রবেশ করলে লাবণ্য গিয়েছিল যোগমায়াকে ডেকে আনতে। চতুর্দিকে বই, তার মধ্যে আছে ইংরেজি সাহিত্যের বই। এসময়ে অমিতের মানসিকতা ছিল এইরকম—"সব লাবণ্যর পড়া বই, তার আঙুলে-পাতা ওলটানো, তার দিনরাত্রির-ভাবনা-লাগা, তার উৎসুক-দৃষ্টির-পথ-চলা, তার অন্যমনস্ক দিনে কোলের উপর পড়ে-থাকা বই।" এটা ভেবে অমিতের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। একসময় অমিত দেখতে পেল টেবিলে রয়েছে ইংরেজ কবি ডনের কাব্য সংগ্রহ। অক্সফোর্ডে থাকার সময় ডন ছিল অমিতের প্রিয় কবি। পূর্বরাগকে গভীর ভালবাসায় রূপান্তরিত করার কাজে ডন উপস্থিত হলেন আশীর্বাদের মতো। অমিতের এতদিনকার নিরুৎসুক ও একঘেয়ে মনটা হঠাৎ সজীব হয়ে উঠল।

অমিত বাক্‌পটু। প্রথম পরিচয়ের সময় লাবণ্যর সঙ্গে বা যোগমায়ার সঙ্গে তার বাক্যালাপের কথা এপ্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। লাবণ্য দুর্ঘটনার ব্যাপারে নিজের ভুল স্বীকার করে বলেছিল পথ ভুল করে সে যখন উপরে যাচ্ছিল তখনই 'উপরওয়ালার ধাক্কা খেতে হল'। উত্তরে অমিত বলেছিল—"উপরওয়ালার উপরেও উপরওয়ালা আছে একটা অতি কুশ্রী কুটিল গ্রহ, এ তারই কু-কীর্তি।" যোগমায়ার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর যোগমায়া অমিতের কাকাকে প্রশংসা করে বলেছিলেন তিনি এক মামলায় বিরাট লোকসানের হাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন। উত্তরে অমিত বলেছিল "আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বউদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা।" প্রথম পরিচয়েই মানুষের মন জয় করার দৃষ্টান্ত হিসাবে এই উদ্ধৃতি দুটি ব্যবহার করা হল। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে রয়েছে অমিতের এই বাক্‌চাতুর্যের নিদর্শন। বাস্তবিক আগাগোড়াই অমিত কথার জাল বুনে চলেছে এবং এই বাক্-কুশলতাকে সম্বল করেই সে সকলের মন জয় করেছে।

অমিতের ব্যক্তিত্ব এবং অন্যের মধ্যে নিজেকে মেলে ধরার ক্ষমতা লক্ষ্য করা গেছে লাবণ্যর প্রতি অমিতের প্রণয় নিবেদনের ঘটনায়। সেদিন পথে হঠাৎই লাবণ্যর সঙ্গে অমিতের দেখা হয়ে গিয়েছিল। লাবণ্য অমিতকে এড়িয়ে যেতে চাইলেও অমিত তা হতে দিল না। তারপর একটি নির্জন স্থানে বসে নানা কথাবার্তার ফাঁকে অমিত উচ্চারণ করল ডনের কবিতার একটি অংশ 'For God's sake, hold your tongue/and let me love'। এরপরেই অমিত এই কবিতার বঙ্গানুবাদ করে নিজের হৃদয়ের বার্তাটিকে লাবণ্যর কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিল। শোভনলাল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'দ্বিধা করে নিজেকে যে পুরুষ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না করায় মেয়েরা তাকে স্পষ্ট করে

প্রত্যক্ষ করে না।" এটা অমিতের পক্ষে খাটে না। নিজেকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করা, তাড়াহুড়ো করা তার স্বভাব। সে চলে আবেগের তাড়নায়। চোখে তার স্বপ্ন, জীবন গড়ার স্বপ্ন। বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে যে ফারাক থাকতে পারে এটা সে বোঝে না। এটাই তার চরিত্রের সম্পদ, এটাই তার চরিত্রের দুর্বলতা।

তাড়াহুড়ো করাটা অমিতের স্বভাব বলেই প্রণয় চেতনার উন্মেষের পরেই সে গিয়েছিল যোগমায়ার গৃহে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। যোগমায়া অমিতের প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি জানালেন। আসলে অমিতকে দেখেই যোগমায়ার ভালো লেগেছিল এবং ঠিক করে ফেলেছিলেন লাবণ্য-অমিতের বিবাহ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। এরপর লাবণ্য-অমিতের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ট হল। লাবণ্য হল বন্যা, অমিত হল মিতা। লাবণ্য, অমিতের চরিত্রকে প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিল, তাই অমিতের মুখে যোগমায়ার সম্মতির প্রস্তাব শুনে বলেছিল—"তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহু দূরে পিছিয়ে পড়ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না...বিয়ে করে তখন গ্রন্থি খুলতে গেলে তাতে আরো জট পড়ে যাবে।" লাবণ্য যথার্থই অনুভব করেছিল অমিত সংসার ফাঁদবার মানুষ নয়। সে রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্য ফেরে। আর সেই তৃষ্ণা মেটাবার জন্যই সে লাবণ্যর কাছে এসেছে। এসময় লাবণ্য বলেছিল যে অমিত সর্বদাই বিয়েটাকে 'ভাল্‌গার' বলে মনে করে—"ওটা শাস্ত্রের-দোহাই-পাড়া সেই-সব বিষয়ী লোকেদের পোষা জিনিস, যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধর্মিনীকে মিলিয়ে নিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে।" অমিত এই অভিমতের সত্যতা স্বীকার করে বলেছিল "কী আশ্চর্য করেই তুমি আমার চরিত্রের ব্যাখা করেছ।" তবে অমিত এটাও বিশ্বাস করে মানুষের চরিত্রটাও চলে, সময় ও পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তা বদলায়। অমিত মনে করে—"...দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নতুন করে সৃষ্টি করা চাই।"

অমিতের মধ্যে একটা ছেলেমানুষীভাব আছে বলেই যোগমায়া তাকে পছন্দ করেন। তিনি অবাক হন এই ভেবে যে—"এত বিদ্যে, এত বুদ্ধি, এত পাস, অথচ এমন সাদা মন। গুছিয়ে কথা বলবার কী অসামান্য শক্তি।" তাঁর চোখে অমিতকে লাবণ্যর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ঠেকে। যোগমায়া অনুভব করেছিলেন অমিত লাবণ্যকে খুবই ভালবাসে, এই ভালবাসার কারণে অমিতের দুরন্ত মন অনেকটাই শান্ত হয়ে গেছে। লাবণ্য সবই স্বীকার করে। তবে সে বুঝতে পারে অমিত সাধারণ ঘরের মেয়ে লাবণ্যকে দেখতে পায়নি, সে তাকে গড়ে তুলেছে কথা দিয়ে ; সে বোঝে অমিত চির পলাতক। লাবণ্যর মনে অমিতকে নিয়ে যেটা কাজ করে তা হল একটা স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের ঘোর কেটে গেলে চির পলাতক অমিতের যে আর ঠিকানা পাওয়া যাবেনা সেটা সে বোঝে। এটা শুধু যে লাবণ্যর উপলব্ধি এমন নয়, লিলি গাঙ্গুলিও অনুভব করেছিল। লিলি গাঙ্গুলি এক সময় অমিতকে বলেছিল পাগলা স্যাকরার মত সোনার মুহূর্ত সৃষ্টি করাই অমিতের স্বভাব এবং সেই মুহূর্তটিকে আনমনে সে যে কতবার ভুলে গেছে তার হিসেব নেই। কেটি মিটারও সিসিকে বলেছিল—"তোমার দাদার মনটা চিরদিন ওপরে পা করে হাঁটে।"

অমিত যে চির পলাতক, তার সৃষ্টি করা সোনার মুহূর্ত যে ক্ষণে ক্ষণে তৈরি হয় এবং তা চিরতরে হারিয়ে যায় সেটা বোঝা গেছে অমিতের পরবর্তী কার্যকলাপে। শিলঙে প্রেমের পাগলামিতে যখন সে মেতে উঠেছিল তখন পৃথিবীর সব কিছু তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল। আবার লাবণ্যর সাথে বিচ্ছেদের পর অমিত নতুন করে মেতে উঠল কেতকী মিত্রকে বদল করার কাজে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে সাত বছর আগে এই কেতকীকে ভালবেসেই অমিত তার হাতে আংটি পরিয়েছিল। তারপর অমিতের অনাদরে কেতকী হয়ে উঠল কেটি মিটার। লাবণ্যর সাথে পরিচয়ের পর সে লাবণ্যর ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা নারীত্বকে জাগিয়ে দিয়েছিল। ইতিহাস এবং সাহিত্যের শুষ্ক পাতা থেকে জেগে উঠেছিল লাবণ্যর অন্তরের প্রেমিকা-সত্তা—প্রথমে অমিতকে ঘিরে, পরে শোভনলালের স্মৃতিকে আশ্রয় করে। এ বিষয়ে যে অমিতের ভূমিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করেছে এটা অস্বীকার করা যায় না। এরপর অমিত যখন কেতকী মিত্রকে নিয়ে পড়ল তখনও সে সফল হয়েছে। এসময় পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, রুচিবোধ সবদিক থেকেই অমিত কেতকীকে বদলে দিতে পেরেছিল। অমিতের অনাদরে যে কেতকী কেটিতে পরিণত হয়েছিল নতুন করে আদর দিয়ে অমিত তাকে রূপান্তরিত করল কেয়াতে।

শেষ পরিচ্ছেদে অমিতের রূপান্তর এবং দার্শনিক উক্তিগুলি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। এতদিন অমিত কথা দিয়ে মূর্তি গড়বার শখ মিটিয়েছে। তার আচার-আচরণের সঙ্গে বাস্তবের যোগসূত্র ছিলনা বললেই চলে। সেই অমিত বাস্তব সচেতন হয়ে যখন যতিশংকরের কাছে সঙ্গ-আসঙ্গ তত্ত্ব প্রকাশ করে, তখন অবশ্যই সংশয়ান্বিত হতে হয়। হীরেন চট্টোপাধ্যায় যথার্থই প্রশ্ন তুলেছেন—''অমিত 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে যে তত্ত্ব প্রচার করেছে তা রীতিমত রহস্যময়।...সেজন্য তার কথা মাঝে মাঝেই জট পাকিয়ে গেছে''[২]। বুদ্ধদেব বসুও এ সম্পর্কে বলেছেন—''অমিত লাবণ্যর বিয়ে হলেও চলতো, না হলেও চলতো—কিন্তু যেটা বেসুরো লাগে সেটা হল তত্ত্বকথার দ্বারা ঘটনার সমর্থনের চেষ্টা।''[৩] তিনি যথার্থই বলেছেন ''গ্রন্থিমোচন বা উপসংহার যেন হঠাৎ দ্রুতবেগে ঘটে গেলো।''[৪] অমিত চরিত্রের পরিবর্তনের এই ইতিহাসটির ইঙ্গিত আছে, কিন্তু বিস্তৃত বিবরণ নেই। অমিত যতিশংকরকে বলেছিল ''কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই ; কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি ; সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।'' বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার যে একটা দুস্তর ব্যবধান আছে এটা বুঝেছিল

---

২. 'এসেছে রবির কর' ২০০৬, পৃ. ১১৮

৩. 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য', ১৯৮৩ পৃ. ১৩৮

৪. প্রাগুক্ত

লাবণ্য। অমিত বাস্তবের ভূমিতে পা রেখে চলে না এটা অন্যেরাও বুঝেছিল। প্রাত্যহিকের রূঢ় বাস্তবের স্পর্শ অমিতের স্বপ্নের জগতকে ভেঙে চুরমার করে দেবে বলেই লাবণ্য অমিতের বিবাহ প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়েছিল। সম্পর্কচ্ছেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো লাবণ্যই গ্রহণ করেছিল। তাই ঘড়ার জল বা দিঘির জলের প্রসঙ্গ বা তত্ত্ব-ব্যাখ্যা লাবণ্যর মুখে শোনা গেলে যথাযথ হত। অমিতের এই উপলব্ধি যেন অনেকটাই আকস্মিক।

অমিত চরিত্রের এজাতীয় পরিণতিটি যে দুর্বল এবং খাপছাড়া গোছের এটা মেনে নিয়েও রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। অমিত এক সময় বলেছিল—"মনের আয়নায় নিজের বাঁধা মতগুলিকে আঁকড়ে রাখা যায় না কারণ তাতে চলতি মুহূর্তের প্রতিবিম্ব পড়ে"। অমিত আরও জানিয়েছে "'বন্ধনহীন গ্রন্থি'তে সে চলতি হাওয়ার পন্থী।" সে বিশ্বাস করে 'মানুষের চরিত্র জিনিসটাও চলে।' অমিতের চরিত্রও এভাবে এগিয়ে চলেছে। তার ফলে তার স্বভাবের মধ্যে ঘটেছে পরিবর্তন। 'শেষ সন্ধ্যা' পরিচ্ছেদে অমিত লাবণ্যকে বলেছ "যে বদল আজ আমার হল এযে যুগবদল, তার মাঝখানে একটা কল্পান্তর।" এরপরেই কলকাতা থেকে তার আত্মীয় বন্ধুদের আগমন, কেটি মিটারের আংটির প্রসঙ্গ উত্থাপন এবং লাবণ্যর অন্তর্ধান অমিতের 'জাত বদলে' বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। অমিত ফিরে এল বাস্তবের পটভূমিতে, এর পরেই লেখক শেষ পরিচ্ছেদে অমিতের রূপান্তরিত রূপটি দেখালেন। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই রূপান্তরের প্রসঙ্গটি লেখক উহ্য রেখেছেন। বাস্তবিক উপসংহার যেন হঠাৎ দ্রুত বেগে ঘটে গেল। এজন্য অমিতের এবং সেই সঙ্গে 'শেষের কবিতা'র পরিণতি সম্পর্কে সমালোচকেরা প্রশ্ন তুলেছেন।

লাবণ্য

লাবণ্য চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে বলেছিলেন—"লাবণ্যর সঙ্গে যেন আমার চেনাশুনা আছে, খুব যেন তাকে দেখেছি।"[১] লাবণ্য সম্পর্কে কবির এজাতীয় অভিমত থেকে বোঝা যায় চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের সুগভীর ভাবনার পরিণতি এবং লাবণ্য সম্পর্কে তিনি একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারেই অগ্রসর হয়েছেন। 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ প্রেম সম্পর্কিত যে তত্ত্বকথা তুলে ধরতে চেয়েছেন তার অন্যতম ধারক হল লাবণ্য। ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের একটি অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—"রবীন্দ্রসাহিত্যের নায়িকা বলতে সাধারণভাবেই ব্যক্তিত্বময়ী নারীর কথা আমাদের মনে পড়ে। সেই অর্থে 'শেষের কবিতা'র নায়িকা লাবণ্য ব্যতিক্রম নয়।"[২] এই উপন্যাসের কাহিনি জটিল নয়, ঘটনার গতি দ্রুত পরিণামমুখী ; প্রধানত দুটি চরিত্রকে

১. নির্মলকুমারী মহলানবীশ, 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে', পৃ. ৮৫

২. 'এসেছে রবির কর', ১৪১২, পৃ. ১১৯